Rs. 2.00

PRABINBARTA

প্রবীণবার্তা

MONTHLY

মূল্য ঃ ২ টাকা

মাসিক

Vol : XIII Issue : VII, 15th, October, 2023 ১লা আশ্বিন, ১৪৩০, বার্ষিক মূল্য-২০ টাকা RNI NO. WBBEN/2012/46375

সম্পাদকীয়

এই মাসটা দুটি কারণে আমাদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত পয়লা অক্টোবর বিশ্ব প্রবীণ নাগরিক দিবস দ্বিতীয়ত ২১ তারিখে শুরু হচ্ছে বাঙালির শ্রেষ্ঠ সামাজিক অনুষ্ঠান দুর্গোৎসব।

আমাদের বিশ্ব প্রবীণ নাগরিক দিবস নিয়েই সর্বাগ্রে আলোচনা করা উচিত। বিভিন্ন পরিসংখ্যানে বলছে ২০৫০ সালে প্রতি ১০ জন ভারতীয় মধ্যে কমপক্ষে তিনজন হবেন প্রবীণ। অর্থাৎ আমাদের মানে প্রবীণদের সংখ্যা ভারত তথা পৃথিবীতে ক্রমবর্ধমান। স্বভাবতই সমস্যাও ক্রমবর্ধমান। চিকিৎসা, স্বাস্থ্য, পারিবারিক সম্পর্ক, সামাজিক উপেক্ষা ইত্যাদি ইত্যাদি। এ যেন এক অনন্ত দুঃখের পাঁচালি। কিন্তু এবার আমরা বিষয়টা একটু অন্যভাবে দেখব।

পাঁচের দশকে আমরা সিনেমা দেখতাম খোলা মাঠে প্রজেক্টর চালিয়ে, এখন দেখি ঘরে বসে স্মার্টফোনে বা টিভিতে। আমরা উত্তম কুমারকে দেখেছি আবার শাহরুখ খানকেও দেখতে পাচ্ছি! পিঠে-পুলির স্বাদ আমরা পেয়েছি আবার পিজাও খাচ্ছি। বৃষ্টি ভেজা কাদা মাঠে চুনি গোস্বামীর ড্রিবলিং দেখেছি আর এখন ঘরে বসে মেসির ফ্রি কিক দেখছি! খারাপ কী! হ্যাঁ, একটু আধটু গ্যাসের ব্যথা, রক্তের উচ্চচাপ-নিম্নচাপ বা শর্করার বৃদ্ধি কিংবা প্রায়শই হাঁটু দুটোর একযোগে বিদ্রোহ ঘোষণা— এসব তো আছেই! তবে মূল্যবোধের অভাব বা সামাজিক অবক্ষয় মনে বড় বেদনা জাগায়। আবার মনে হয় আমাদের বাবারাও হয়তো এই কষ্ট পেয়েছেন। পাঁচের দশকে আমাদের চালচলন হয়তো তাদের কাছে বিসদৃশ ঠেকত। এইটুকু ছাড়া আমরা বিন্দাস আছি। কাজের যোয়ালটা ঘাড় থেকে নেমে গেছে! কেউ পড়ুক না পড়ুক,মনের আনন্দে লিখে চলেছি, শুনুক না শুনুক গান গেয়ে যাই, দেখুক না দেখুক নাটক করি! আগামী ৯ তারিখ বিকেলে আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবসটাকে আমরা এভাবেই পালন করব! অশীতিপর সদস্য-সদস্যাদের নিয়ে জন্মদিনের মজা করব! একজন মানুষ সরকারি সাহায্য ছাড়া একটা মৃত নদীকে প্রাণ দিয়েছে সেই গল্প শুনব!

পূজা ভালো কাটুক। বেথুনের পক্ষ থেকে সবাইকে জানাই বিজয়ার আগাম প্রীতি ও শুভেচ্ছা।

সময়ের দাগ

গাজী মহম্মদ আবুবকর

ঘাসিপাড়ার করম পরব

পুরুলিয়ার অরণ্যশোভিত অযোধ্যা পাহাড়ের কোলে একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম বাগমুণ্ডি। তারই পাশে হিকিমডি, আলোর নিচে অন্ধকারের মত ছোট্ট নিরন্ন গ্রাম। সেখানে পঁচিশ-তিরিশ ঘর ঘাসি পরিবার বাস করে। এরা হরিজন সম্প্রদায়ের মানুষ। মাটির নিচু নিচু খড় বা খাপড়ায় ছাওয়া ঘরে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে কোন রকমে এদের 'সাঁঝ-বিহান' কাটে। বছরের মধ্যে শুধু উৎসবের কয়েকটি দিন তারা নাচে-গানে-আনন্দে মেতে থাকে।

ঘাসিরা নামের শেষে 'মাছোয়ারা' পদবী যোগ করে, কিন্তু মাছ-ধরা ওদের পেশা নয়। তেমনি ঘাস কাটাও ওদের পেশা ছিলো না কখনো। ওদের কারো কারো দেহে আদিবাসীসুলভ কিছু বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। বাগমুণ্ডির রাজবাড়ির আনুকূল্যে হিকিমডি গ্রামে কতকাল ধরে বসত করছে তা ওরা নিজেরাও জানে না। বর্ণাভিমানীরা অপ্রয়োজনে ওদের আঙিনা মাড়ায় না। ওদের উৎসব-অনুষ্ঠানে অন্য সম্প্রদায়ের মানুষ কদাচিৎ যোগ দেয়।

ঘাসিরা সারা বছরের মধ্যে মাত্র তিন-চারটি পরব ধুমধাম করে পালন করে। মকর সংক্রান্তির 'টুসু', অঘ্রাণ মাসে কালী পুজোর সময়ে 'বাঁধনা' আর ভাদ্র মাসে জীমূতবাহনের পুজো উপলক্ষ্যে 'জিতা' বা 'জিতুয়া'।

করমপুজো হয় ভাদ্র মাসের শুক্লপক্ষে। তখন আনন্দের হিল্লোল বয়ে যায় ঘাসিকুলিতে। বেজে ওঠে ধমসা, ঢোল, সানাই, বাঁশি। ছেলে-বুড়ো, কুমারী-বউ, শাশুড়ি-ননদ ব্যাকুল হয়ে দিন গোনে করম পরবের অপেক্ষায়। তাদের টাঁড় জমির মত নিষ্ফলা জীবনে আনন্দধারা সিঞ্চন করতে আসেন করম গোঁসাই।

পশ্চিম সীমান্ত বাংলায় ঘাসি ছাড়া অন্যান্য জনগোষ্ঠীর মানুষও করম পরব পালন করে। সাঁওতাল, ডোম, হাঁড়ি, বাউরি, মালি— এরাও করম পুজো করে। মানভূমী মানুষের কাছে ভ্রাতৃ দ্বিতীয়র মতোই করম পুজোর মাহাত্ম্য। তাদের বিশ্বাস, করম ঠাকুরের কৃপা হলে ভাইয়ের সুখ-সমৃদ্ধি হয়, বোনেরা ভাই-এর বাড়ি এসে আনন্দ বিনোদন করতে পারে। বিবাহিত মেয়েরা এ সময়ে কয়েক দিন বাপের বাড়িতে এসে কাটিয়ে যায়।

ঘাসিপাড়ার প্রবীণ কোঁকা মাছোয়ার করম পরবের দিনকয়েক আগে এসে আমাকে বললেন— 'হামদের কুলিতে নাচ-ডেগ হবেক, আপনাকে যাতে হবেক। করমগীত শুইনবেন, নাচ-ডেগ দেইখবেন।' আমি সানন্দে রাজি হয়ে তাঁকে জানিয়ে দিলাম, যাবো। করম পরব সম্পর্কে কোঁকা আমাকে বেশ কিছু তথ্যও জানালেন। একটা করমগীত শুনিয়েও দিলেন। কীভাবে করম গাছ বাড়ির আঙিনায় পুঁতে তার চারিপাশে সারিবদ্ধভাবে মেয়েরে নাচে তারই বর্ণনা আছে এই গানে ঃ

'বিচে করম ডালি,
চৌপাশেসারি সারি
ভাবে ডোলে নাগিনী যেমন গো—
হরষিতে নাচে গোপিগণ।
বাজে মৃদঙ্গ ঢোল,
মুখে বলত বোল,
করে বাজে বলয় কঙ্কন গো—
হরষিতে নাচে গোপিগণ।...'

কোঁকোর গানের গলা বেশ। তরুণ বয়সে তিনি নামী 'ছো-নাচয়া' ছিলেন। বাগমুণ্ডির রাবাড়ির ওস্তাদ ভিখা নায়ার কাছে ছোনাচ শিখেছিলেন। কোঁকা জানিয়ে গেলেন, যে—করম গাছটিকে বন থেকে কেটে এনে 'গাড়া' হবে তাকে ইতিমধ্যে 'বরাত' দিয়ে আসা হয়েছে।

ভাদ্র মাসের শুক্ল পক্ষের একাদশীর রাত্রি। করমের নাচ-ডেগ দেখতে বেরোলাম ঘাসিকুলির উদ্দেশে। রাত্রি আটটা, আধা অন্ধকার। আকাশে চাঁদ মেঘের আড়ালে লুকোচুরি খেলছে। পথ চলে গেছে সায়ের বাঁধের পাশ দিয়ে ঘাসিকুলির দিকে। পথ পিছল, বিকেলবেলায় এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে. পথের ডান ধারে নিঝুম অযোধ্যা পাহাড় রহস্যের বোরখা পরে দাঁড়িয়ে আছে। এসব এলাকায় রাত্রে বুনো হাতির ভয় আছে। পাহাড় থেকে নেমে এসে কখন যে পথ আগলে দাঁড়াবে ঠিক নেই।

ঘাসিপাড়ায় পৌঁছে দেখি হ্যাজাকের আলোয় আঙিনা ঝলমল করছে। করমের ডাল পোঁতা হয়েছে সুখরামের ঘরের সামনে কুলগাছ তলায়। তার নিচে 'জাওয়া' পাতা হয়েছে। মেয়েরা নদী বা 'জোড়' থেকে বালি এনে টুকিতে বা ডালায় রেখে মুগ ডাল ছড়িয়ে দেয়। দু-একদিনের মধ্যে মুগ থেকে পুং (অঙ্কুর) বেরোয়। একেই বলে 'জাওয়া'। পাড়ায় মেয়েরা চার-পাঁচ দিন ধরে 'জাওয়া' জাগিয়েছে। রাতভর চারপাশে ঘুরে ঘুরে নাচ-গান করাকে বলে জাওয়া জাগানো। আজ উৎসবের শেষ রাত্রি—একাদশীর 'জাগরণ'। মেয়েরা আজ সারাদিন উপোষ করেছে। সারা রাত্রি তারা নাচ-গান করবে। আগামী কাল সকালে সায়ের বাঁধে জাওয়া ভাসিয়ে এলে শেষ হবে পরব।

খোঁজ নিয়ে জানা গেলো, পুজো-পাঠ এরই মধ্যে শেষ হয়ে গেছে। ঘাসিদের পুরোহিত নেই। নিজেরাই পুজো সেরে নিয়েছে। এখন 'কহনী'র আসরে সকলে জড়ো হয়েছে। 'কহনী' শোনাচ্ছে সত্য মাছোয়ার। লম্বা কালো দশাসই তার চোহারা। মাথায় ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়া চুল। দেখলে মনে হয় অযোধ্যার অরণ্য থেকে নেমে এসেছে আদিম মানুষ। দেহে তার রুক্ষতা আছে কিন্তু তার মেজজাটি ভারি মিষ্টি। তার কাহিনী পরিবেশনের ভঙ্গিও ভারি চমৎকার। কাহিনী অনেকেই জানে কিন্তু এমন সুন্দর করে পরিবেশন করতে কজন পারে। এ-কুলির অনন্ত আর পুঁইতুও নাকি ভালো 'কহনী' বলতে পারে।

করম উৎসবের প্রতিষ্ঠাতা প্রবাদপুরুষ 'ধরম' আর 'করম'-কে নিয়ে কাহিনী। শ্রোতারা গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনছে আর মাঝে মাঝে সমঝদারের মতো 'হঁ' বলে যাচ্ছে। কাহিনীটি মোটামুটি এই রকম ঃ ধরম আর

করম দুই ভাই। তাদের সংসার চলে ভিক্ষে করে। ধরম একদন ভিক্ষে করতে বেরিয়ে ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে পড়লো। অবশেষে একটি গাছের তলায় এসে ছায়ায় শুয়ে পড়লো, তারপরে ঘুমিয়ে পড়লো। ঘুমের মধ্যে স্বপ্নে তাকে দেখা দিলেন করম গোঁসাই। বর দিলেন তিনি, ধরম এবার থেকে সুখী ও সম্পদশালী হবে। একটি করম গাছ দেখিয়ে তিনি বলে দিলেন, সেটাকে কেটে এনে পুঁততে হবে আর তাকে ঘিরে নৃত্য-গীত করতে হবে। যদি মনে কোন অভিলাষ থাকে তাহলে তা জানাতে হবে। করম ঠাকুরের কৃপা হলে মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে।

কহনীর আসর শেষ হয়ে হেলে আঙিনায় নাচের প্রস্তুতি শুরু হলো। করম পুজোর আয়োজন হয়েছে সুখরামের ঘরে। তার ছোট ভাই শ্যামলের জন্ম এই তেরো বছর হল— প্রতিবছরই করম পুজো হচ্ছে। শ্যামলের জন্মের আগে তার মা মানত করেছিলো। পাশের আঙিনায় মতিলালের আর উপর কুলির পুঁইতুর বাড়িতেও করম পুজোর আয়োজন হয়েছে।

সুখরাম অতিথি আপ্যায়ণের কাজে খুবই ব্যস্ত। মনে হয়, তার পেটে মহুল পড়েছে বলে তার গলার স্বর কিছুটা জড়িত, হাঁটাচলা একটু বেসামাল। তার বউ টেপু আনন্দে যেন ঝলমল করছে। আজ সে নতুন ছাপা শাড়ি পরেছে, মাথায় আবার ফুল গুঁজেছে। চোখে কাজল পরেছে, পরিপাটি করে চুল বেঁধেছে। তার দেহ থেকে প্রতিদিনের দারিদ্র্যের মালিন্য মুছে গেছে। সে এগিয়ে এসে বললো— 'সায়েব, তুমি আস্যেছ। হামদের সঙ্গ সারা রাইত জাইগতে হবেক। আজ হামদের জাগরণ।'

সুখরাম বাজনদারদের মদ খাওয়ার বন্দোবস্ত করতে লাগলো। পেটে মদ না পড়লে নাকি বাজনা জমে না। এর ফাঁকে তাকে কাছে পেয়ে জিগ্যেস করলাম,— 'তুমি এক্ষুনি খেয়েছ নাকি?' সে দ্বিধাজড়িত গলায় স্বীকার করলো—'হঁ, টুকু খেয়েছি। বেশি নাই খাই।' —'বাজনদারদের কি মদ দিচ্ছো, হাঁড়িয়া?'—'না বাবু হাঁড়িয়া লয় চুয়ান মদ।' সে গর্বের সঙ্গে গড়গড় করে বলতে লাগলো, এ-বছর তার আট কিলো মহুল কিনতে হয়েছে। মদ তৈরি বাবদ তার মোট খরচ হয়েছে ষাট টাকা। সব মিলিয়ে শ'দেড়েক টাকা খরচ হচ্ছে। তার খরচের ফিরিস্তি শুনে আমার অবাক লাগলো। এ-যে বাঙালির দুর্গাপুজোয় ধার-দেনা করে ব্যয়-বাহুল্য দেখানোর মতোই। সুখরামের ঘরে কোনো কোনো দিন উনোন জ্বলে না। টেপু যে বাড়িতে কামিনের কাজ করে সেখান থেকে ধার কর্জ করে এনে সংসার চালায়। অথচ পরবে খরচের বহর কী!

এদিকে করম ডাল ঘিরে নাচ শুরু হয়ে গেছে। মেয়েরা একে অপরের কোমরের হাত ধরাধরি করে নাচতে লাগলো। সারিবদ্ধ হয়ে, একটু গা-ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে। কখনো এক পা এগিয়ে ঝুঁকে, আবার এক পা পিছিয়ে সোজা হয়ে। বাজনার তালের সঙ্গে পা মিলিয়ে নাচের ছন্দ। কান ফাটানো আওয়াজ সৃষ্টি করে হীরালাল নাগরায় চোট লাগাচ্ছে। ঘেটমা কালিন্দির ঢোলের আওয়াজে রাত্রির আকাশ বিদীর্ণ হচ্ছে। তারই সঙ্গে মিলেছে জগন্নাথ কালিন্দির শায়নার সুরের মূর্চ্ছনা। জগন্নাথ পদ্মশ্রীপ্রাপ্ত গম্ভীর সিং মুড়ার ছোনাচ দলের 'শাইনদার'। বাজনদাররাও ঘুরে ঘুরে নাচছে।

নাচের সারিতে জিতন, টাঁড়ি, বিজলা। তরুণী টেপু, মাঝ বয়সী রেংটী, প্রৌঢ়া রানী। মেয়েদের এই নাচকে 'ডাঁড়-ধরা' নাচ বলে। ('ডাঁইড়' নাচ বা দাঁড়ি-নাচ অর্থাৎ সারিবদ্ধ নাচ)। নাচের সঙ্গে যে গান তাকে বলে 'ডাঁড়শালিয়া'। নৃত্যরতা মেয়েরা গাইছে ঃ

'করম কাটি কাটি
আখড়া বন্দনা করি,
যত গোপি করে একাদশী
আজি তো করম এক রাতি'।...

করমের গান-বাজনা শুরু হতেই আঙিনা লোকে লোকে ভরে গেলো। মেয়েরা বিরতিহীনভাবে ছোট ছোট করমগীত গাইতে লাগলো, সঙ্গে নাচ। সব গানেরই একই সুর। প্রাত্যহিক জীবনের সুখ-দুঃখ-আনন্দ বেদনার রসে সিক্ত টুসু গানের মতো মুখে মুখে এসব গান রচনা করে গ্রামের মেয়েরা।

নাচ-গান চলছে, এমন সময় রেংটী নাচের সারি থেকে বেরিয়ে এলো। একটি টিনের গ্লাস যোগাড় করে তাতে মদ ভর্তি করে আনলো। তারপরে সকলের সামনেই ঢক ঢক করে গিলে ফেললো। এই মুহূর্তে কারো সংকোচ বা দ্বিধা নেই। সকলেই মাতোয়ারা। এক এক জন কিছুক্ষণ পর পর ঘরের মধ্যে গিয়ে সেই তরল সুধা পান করে আসতে লাগলো।

সুখরাম তার কোলের দেড় বছরের ছেলেকে নিয়েই নাচের সারিতে দাঁড়িয়ে গেলো। তারপর সে গান ধরলো—

'বাগমুণ্ডি বাজারে
লাহের বড় চটি,
লাহের দৌলতে দাদার
এঁড়ি সমান ধুতি'।...

এ অঞ্চলে লাক্ষার (স্থানীয় ভাষায় 'লা') চাষে বা কারবারে অনেকের কপাল ফিরে যায়। তেমনই বর্ণনা এই গানের মধ্যে। আমি সুখরামকে জিগ্যেস করলাম, গানটা কে বানিয়েছে। সে নিজের বুকে গর্বের সঙ্গে হাত দিয়ে বললো—'হামি-ই'।

পাশের আঙিনায় মতিলালও করম পুজোর আয়োজন করেছে। করমডাল পোঁতা হয়েছে, জাওয়া পাতা হয়েছে। কিন্তু আনন্দ-উল্লাস নেই, আলোর রোশনাইও নেই। মানুষজন কেউ নেই। ঘরের দেয়ালে টাঙানো একটা হ্যারিকেন টিমটিম করে জ্বলছে শুধু। জানা গেলো, কোঁকা মাছোয়ারের দুই ছেলে বনু আর রনু হঠাৎ খুবই অসুস্থ হয়ে পড়েছে। আঙিনায় নাচ-ডেগের আসরের প্রধান গায়ক হিসেবে ওরই থাকবার কথা ছিলো। কোঁকা উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ছোটাছুটি করছেন— একবার হাসপাতাল, একবার বাড়ি।

উপর কুলিতে পুঁইতুর আঙিনায় দারুণ নাচ-গান জমেছে। লোকও জড়ো হয়েছে অনেক। নৃত্যরতা মেয়েরা গাইছে ঃ

'পহিলা শরাবন মাসে
আসিলাম শ্বশুর ঘরে,
ভাদরে আর কি মন মানে
শ্বশুর ঘরে রে'।...

রাত ক্রমে গভীর হচ্ছে, নাচের তালও দ্রুত হচ্ছে! উৎসব মুখর রাতে সকলেই মাতোয়ারা। ঘাসি পাড়ায় আজ রাত্রে প্রাণের কল্লোল জেগেছে। কিশোরী বৈশাখী এসে যোগ দিলেন নাচের সারিতে। মাত্র মাস

তিনেক আগে তার বিয়ে হয়েছে। মালতিও আছে নাচের সারিতে। পরবে সেও শ্বশুরবাড়ি থেকে এসেছে। ইতিমধ্যে নাচের আঙিনায় হটাৎ এক 'মাঝি মেঝাইন' (সাঁতাল দম্পতি) জুটির উদয় হৈ-চৈ ফেলে দিলো। তাদের বিচিত্র পোশাখ দেখে ছেলে-মেয়েরা তাদের ভিড় করে ঘিরে ধরেছে। বৈশাখীরই ছোট বোন লক্ষ্মী রঙিন শাড়ি পরে মাথায় জরির ফিতে বেঁধে কানে ঝুমকো দুল দুলিয়ে সেজেছে সাঁওতাল বধু। বৈশাখীর বর গলায় রঙিন কাগজের মালা, বাজুতে ময়ূর পুচ্ছের বন্ধনী দিয়ে সেজেছে সাঁওতাল যুবক। একটা তোয়ালে মাথায় জড়িয়েছে আবার। তার গায়ের রঙ তার চুলের রঙের মতোই ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। নাচের আসরে মাঝি-মেঝাইনের উদয়ে কিছু লঘু রসের সৃষ্টি হলো। কিন্তু এরপর যা ঘটলো তা রীতিমতো সাংঘাতিক। রতু মাছোয়ার হঠাৎ আসুরিক মেজাজে নাচের আসরে এসে হাজির। পানোন্মত্ত অবস্থায় সে যে কী করে বসবে সেজন্য সকলেই বিরক্ত ও ভীত। সে তীর ও বল্লম চালাতে জানে। নাচের আসরে আমার উপস্থিতি দেখেই তার রাগের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠছে। তবে সাংঘাতিক কোন কিছু ঘটার আগেই কয়েকজন ছোকরা তাকে জবরদস্তি করে নাচের আসর থেকে দূরে হটিয়ে দিলো। তারপরে রতুর হয়ে আমার কাছে এসে তারা মার্জনা চেয়ে নিলো। গোলমালের মধ্যে নাচ-গান কিছুক্ষণের জন্য বন্ধ হয়ে গেলো। সবার অলক্ষ্যে আমি উঠে এলাম নাচের আসর ছেড়ে। ঘাসিদের জীবনে আছে দারিদ্র্য, শিক্ষাহীনতা, কুসংস্কার। আর মহুলের নেশা ওদের ক্রমাগত ধ্বংসের দিকে টিনে নিয়ে যাচ্ছে। উৎসবের আনন্দ খুবই সাময়িক।

ঘাসি-ঘরের মেয়েরা গৃহস্থের বাড়ি কামিনের কাজ করে। কেউ বা চাষের সময়ে ক্ষেত্রে কৃষি-মজুরির কাজ করে। তা না জুটলে বন থেকে শাল ও পলাশ পাতা বা কাঠ বয়ে এনে বিক্রি করে সংসার চালায়। ওদের মধ্যে কারো নিজস্ব জমি-জিরেত নেই। বাসস্থানটুকু বাগমুণ্ডির রাজ পরিবারের দয়ার দান। দু-চার জনের দু-একটি করে ছাগল, ভেড়া বা গরু আছে। দু-এক জনের পোষা শুয়োর আছে। কারো সঞ্চয়ের অভ্যাস নেই। ছেলে-মেয়েরা বেশির ভাগই স্কুলের দরজায় পা দেয় না।

সারা ঘাসিকুলিতে একটাই ব্যতিক্রম চোখে পড়েছে—আকুল মাছোয়ার (ডাকনাম—আকুল)। নিজের ঐকান্তিক চেষ্টায় তিনি নিজেকে একজন সফল লোকশিল্পী রূপে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। দূর-দূরান্তের লোক তাঁকে চেনে, খাতির করে। গুণী মানুষেরা তাঁকে শিল্পী বলে সমাদর করেন। আকুল ছোনাচ দলে, যাত্রাদলে ফ্লুট ক্ল্যারিওনেট, সানাই বাজান। ঝুমুর গান করেন। ছোনাচও করেন। প্রখ্যাত সংগীত সমালোচক রাজ্যেশ্বর মিত্র বাগমুণ্ডির যুব উৎসবে এসে তাঁর ঝুমুর গান শুনে মুগ্ধ হয়ে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন।

ঘাসিদের মধ্যে আরো অনেক আকুল মাছোয়ার তৈরি হবার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু কে এমন আছে যে ওদের প্রতিভা বিকাশের আর সামাজিক অর্থনৈতিক জীবনে প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব নেবে? নিজের চোখে চব্বিশ বছর আগে দেখা এসব দৃশ্যাবলী। বর্তমানে কতটা পট পরিবর্তন হয়েছে জানা নেই। [লেখাটি আমার 'কালো মানুষ সোনালি সংস্কৃতি' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত (সংক্ষেপিত)।]

১ এপ্রিল থেকে ২০২৩ - ২০২৪ সালের সদস্যপদ নবীকরণ শুরু হয়েছে। অনতিবিলম্বে সদস্যপদ নবীকরণ ও প্রবীণবার্তার জন্য ৫০/- টাকা জমা দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

সুন্দরবনের সুন্দর রূপ

ছায়া মুখোপাধ্যায়

হঠাৎ ক্রীং ক্রীং শব্দে ফোন বেজে উঠল বিকালের পড়ন্ত বেলায় জুলাই মাসের ১৬ তারিখে। হাতে নিয়ে সাড়া দিতেই বেথুন ইনস্টিটিউটের প্রায় সর্বক্ষণের সংগী উমার কণ্ঠস্বর— কাকিমা আমি সুন্দরবন যাব আগামী ২৯শে। আপনি যেতে পারবেন কি? আমি একদম নিশ্চিন্ত সঙ্গী রয়েছে যখন তাহলে তো যেতেই পারি।

আমি-আমার স্বামী দুজনেই ভুগছিলাম। ওনার অবস্থা একটু ক্রিটিক্যাল ছিল। যাই হোক চিকিৎসকের চিকিৎসায় সাড়া দিয়ে অনেকটাই সুস্থ হয়েছেন। আমার তখন মনের অবস্থা ছিল যেদিকে দুচোখ যায় চলে যাব। এমন সময় ছেলে শুনে বললো, তুমি যাও আমি তো আছি। ব্যস্ আমি সম্মতি জানিয়েছিলাম।

উমা কমফোর্ট ট্রাভেলের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করিয়ে দিল। সেইমতো সুমনবাবু আমাদের বাড়িতে এসে প্যাকেজের টাকা নিয়ে গেলেন এবং বললেন যে সুন্দরবনে এই সময় ইলিশ উৎসব হয়। ইলিশের যতরকম পদ হয় তার সবকটিই খাওয়ানো হবে। আবহাওয়া খারাপ বলে আমরা ট্রেনে না গিয়ে ওনারা বাসের ব্যবস্থা করলেন। যে যে স্থান থেকে সকলকে তুলবেন তাও আমাদের সবাই সম্মতি দিলেন। সকলেই কথামত এবং সময়মতো বাসে উঠে গেলাম। বাসে উঠেই স্বাগত জানালেন গরম চা বিস্কুট ও কেক পরিবেশন করে সারাদিনের ভ্রমণের বিবরণ দিয়ে দিলেন। এছাড়া আমাদের কী কী করণীয় এবং বর্জনীয় তারও একটা রূপরেখা বর্ণনা করলেন।

আমরা চলেছি গড়িয়া বাইপাস হয়ে কালিকাপুর, বানতলা, লেদার কমপ্লেক্স, সরবেড়িয়া, ভাঙর, ঘটকপুর, কুলতলী অর্থাৎ উত্তর ও দক্ষিণ-২৪ পরগণার বুক চিরে বাসন্তী হাইওয়ে দিয়ে। স্থানের নামানুসারে এক একটা মোড়ে বড় বড় বাজার। আর রাস্তার দুধারে মল, মিও-আমোরে, ছোট-বড় বিভিন্ন পসরার দোকান সাজানো। পথে পড়ল আদর্শ শিশু নিকেতন, সুকান্ত শিশু নিকেতন, নেতাজি শিশু শিক্ষা কেন্দ্র এবং সুকান্ত কলেজ। বেশ বড় বড় কয়েকটি মসজিদ, গির্জা ও মন্দির। ওগুলো দেখে বোঝা যায় কিছুদিন পূর্বেই সুসজ্জিত হয়েছে নতুন রূপে। আর রয়েছে ছোট ছোট হোটেল ও স্ট্রিট ফুডের দোকান— যাতে বিকাল সন্ধ্যায় ভীড় বেশি। ক্যানিং এর দিকে এগোলে ইটভাটা, মাছের ভেরী, মাছের বিরাট আরৎ। আরও দক্ষিণে এগিয়ে গেলেই গদ্‌খালি বাজার। সামনের দিকে এগোলে দেখা যাবে গদ্‌খালি টাইগার রিজার্ভ ঘাট। এইভাবেই সুন্দরবনের বিশেষ বিশেষ জায়গার নামে ছোট ঘাট তৈরি হয়েছে। আর সেই ঘাটগুলির সাহায্যেই লঞ্চে করে পর্যটকরা সুন্দরবন ভ্রমণ করেন।

সুন্দরবন আসলে জল-জঙ্গলে ভরা স্বকীয় এক সুন্দর ও ভয়ঙ্কর রূপে স্থিত। এই বনই এপাড় বাংলা ও ওপার বাংলাকে তার নিজ স্বরূপে মিলেমিশে একাকার করে দিয়েছে। পুরো সুন্দরবনের ষাট ভাগ বাংলাদেশে আর চল্লিশ ভাগ পশ্চিমবঙ্গে। আর আয়তন প্রায় দশ হাজার কিলোমিটার।

এবার আমরা অর্জুন সাফারিতে উঠে বিদ্যা নদীর ওপর থেকে চলতে লাগলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের টেবিলে চলে এলো ফুলকো লুচি, আচার আলুরদম আর ম্যাঙ্গো সন্দেশ। পরম তৃপ্তিতে বসিয়ে ভ্রমণসংস্থা খাওয়ালেন। কিছুক্ষণ পরে কাউকে দিয়ে ওনারা পথের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে বললেন। একটি বাচ্চা মেয়ে ছোট করে সুন্দর বর্ণনা দিতেই আমাদের গরম চা হাতে এসে গেল।

আমাদের গন্তব্যস্থল গোসাবা জেটিঘাট। দুইধারে বাদাবন। বর্তমানে আমফান ও ইয়াসের ঝড়ে নদীপাড়ের বাদাবন ধ্বংস হয়ে গেছে। স্থানীয় লোকেরা নদীকে বাদা বলে আর বাদার পাশে পাশে যে বন প্রকৃতিগতভাবে সৃষ্টি হয়েছে— তাকেই বলে বাদাবন ইংরাজিতে ম্যানগ্রোভ। এই বনগুলোতে একেবারে নদীর ধার জুড়ে রয়েছে গেঁওয়া গাছ, গরান, হেতাল, জারুল, সুন্দরী গাছ। বনশ্রী সেনগুপ্তর কণ্ঠে গাওয়া— 'সুন্দরবনের সুন্দরী গাছ'। চল্লিশ বছর আগে সুন্দরবন দর্শনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে বর্তমান সুন্দরবনের প্রকৃতি অনেকটাই বিলুপ্ত। এখন অনেক কমার্শিয়াল কমপ্লেক্স ভ্রমণকেন্দ্র হয়ে উঠেছে। একটু একটু করে তার সৌন্দর্য্যায়নের চেষ্টা চলছে। প্রথম থেকেই এখানে মৎস, কাঁকড়া, চিংড়ি সংগ্রহ ও মধু সংগ্রহ করে অর্থ উপার্জন করত। বর্তমানে এখানকার মানুষেরা ধানচায, সবজি চায ও জালবোনা, ধামাকুলো ইত্যাদি কুটীর শিল্পের উপর নির্ভরশীল। চলতে চলতে নদীর ধারে গ্রাম দেখতে পেলাম। সোনার গাঁও। ওইখান থেকেই আমরা অনির্বান মণ্ডল নামে একজন শিক্ষিত বেকার ছেলেকে গাইড হিসাবে পেলাম। খুব সুন্দর তার বাচনভঙ্গী ও ভাষাশৈলী। একদম হাতেব তালুর মতো সুন্দরবনের চালচিত্র আমাদের কাছে তুলে ধরল। অবশেষে গোসাবা-১ ও গোসাবা-২ পরিদর্শন শেষে আমরা আবার লঞ্চে রওনা দিলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের ইলিশ উৎসব শুরু হয়ে গেল। সকলে গোল হয়ে টেবিলে বসে পড়লাম। সকলের কাগজের প্লেটে বাসমতী চালের ভাত, মাছভাজা, ইলেশ মাছের পাতুরী, ইলিশ মাছের ভাপা সঙ্গে স্যালাড, চ্যাটনী, পাপড় ভাজা। সকলের জমিয়ে পরিতৃপ্ত হয়ে আহার সমাপ্তে চলতে লাগলো কোয়ালিটি সময় কাটানো। ক্যুইজ, কবিতা ইত্যাদি সহযোগে। তারপর আমরা কালিন্দী, দুর্গাদুয়ারী বিদ্যানদী ধরেই ঝড়খালি পাখিরালয় ও সজনেখালি দিকে সুন্দরবন-২-এ সকলে গিয়ে হোটেলে উঠলাম। হোটেলটা নতুন সুসজ্জিত সুন্দর ছিল। রাতে চিলি চিকেন ফ্রাইড-রাইস সহযোগে রাত কাটালাম। সকাল সাতটায় চা খেয়ে স্নান সেরে আবার লঞ্চে উঠলাম। এরপর খুব বৃষ্টি পড়ছিল। এবার আমাদের গন্তব্য সজনেখালি ব্যাঘ্র প্রকল্প, কুমীর প্রকল্প, কচ্ছপ প্রকল্প। সাপের গবেষণাগারের জন্য আলাদা একটি স্থান সুরক্ষিত আছে। সেখানে তারা অনুসন্ধান করে জানতে পারবে যে কোন সাপ বিষধর এবং কোন সাপ বিষহীন। মাত্র ছয় প্রজাতির সাপেই বিব আছে। অন্যান্য সাপের বিষ নেই বললেই চলে। কারোর কারোর নামমাত্র বিষ আছে। আমাদের রাজ্যে যে সাপের কামড়ে বেশির ভাগ মানুষ মারা যায় তার নাম কালাচ সাপ। কেউটে সাপে মোটেই বিষ নেই।

কুমীর ও কচ্ছপ প্রকল্প দেখে বেশ হতাশ হলাম। মোটে তাদের দেখা গেল না, চল্লিশ বছর আগে কিন্তু প্রচুর পরিমাণে থাকত। আর বাঘের দেখা তো মিললোই না। তবে বাঘ বিলুপ্তির পথে থাকলেও বর্তমানে ব্যাঘ্র সুমারীতে দেশের দশম স্থান অধিকার করেছে। সুন্দরবনে মোট একশত বাঘের অস্তিত্ব রয়েছে। শিকার ধরাই ওদের প্রধান নেশা। বাঘিনী মা কিন্তু সন্তানস্নেহে ছয় মাস বয়স পর্যন্ত বাচ্চাদের লালন পালন করে।

এবার ফেরার পালা। সজনেখালি থেকে আমরা এসে পৌঁচালাম সুধন্যখালি। খুব বৃষ্টি পড়ছিল তাই আমরা সকলে নামলাম না। দর্শনীয় ওই বনবাদার। তারপরে আমরা দূর্গাদুয়ারী নদীর উপর দিয়ে এসে বিদ্যানদীতে পড়লাম এবং দোবাগে জেটিঘাটে নামলাম। সেখানে ওয়াচ টাওয়ার থেকে এবং একটা উঁচু করে ধাপে(২) সিঁড়ি বেয়ে পায়ে পায়ে পথ চলার একটা সুন্দর ব্যবস্থা আছে। সেখান থেকে গাছপালা, হরিণ, পাখি ইত্যাদি খুব সুন্দর করে দেখা যায়। লঞ্চঘাট থেকে উঠে বাঁক নিয়ে আমরা বিদ্যানদীতে পড়লাম। সেখান থেকে বেশ কিছুটা নদীপথে এগিয়ে এসে আমরা পঞ্চমুখে পরলাম অর্থাৎ পাঁচটি নদীর গতিপথ গিয়ে মাতলা নদীতে মিশে গিয়ে সাগরে গিয়ে মিশে যাচ্ছে। নদীতে জোয়ার-ভাঁটা খেলে চলেছে প্রতিনিয়ত। আর সেই স্থানটি পড়ন্ত সূর্যের বেলায় এক শৈল্পিক রূপদান করেছে। ওপরে রঙ বেরঙের আকাশ—তা মিশে গিয়েছে নদীর শেষ সীমানায়। পৃথিবীটাও সেখানে যেন মিলেমিশে একাকার হয়ে আছে। নদীগুলো ভাঁটার সময় যেমন শান্তরূপ জোয়ারের সময় তেমন উত্তাল-উদ্দাম। এবার আমাদের ভ্রমণ শেষ। বিদ্যানদী দিয়ে বেয়ে আমরা সেই গদখালি টাইগার রিজার্ভ জেটি ঘাটে ফিরে এলাম। ৩০শে জুলাই দ্বিতীয় দিনে মধ্যাহ্নভোজে মেনু ছিল ভেট্‌কি, পাবদা ও চিংড়ি মাছের মালাইকারী সঙ্গে ডাল, কুরকুরে আলুভাজা, চাটনী, পাপর, স্যালাড। চমৎকার ভোজ একেবারে দিলখুশে খাওয়ানো যাকে বলে। অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি ভ্রমণ সংস্থার সকলকে। উন্নতি করুন এটাই আমার আশীর্বাদ রইল।

শৈবতীর্থের সর্বোচ্চ মন্দির তুঙ্গনাথে কিছুক্ষণ

(২য় পর্ব)

সমীর কুমার ঘোষ

সকাল দশটায় চা পান করে রওনা হলাম উখিমঠ উদ্দেশ্যে। কিছুটা চড়াই পথ পেরিয়ে নেমে এলাম সদ্য নির্মীয়মান পথের উপর। এপথ বেশ চওড়া মোটরগাড়ি অনায়াসে চলাফেরা করতে পারবে। শুনলাম পথ প্রস্তুত হয়ে গেলে লেঁখ থেকে উখিমঠ পৌঁছান সহজ হবে। গ্রামের মানুষদের ঘোর বর্ষার কর্দমাক্ত পথ পেরিয়ে আর চলাফেরা করতে হবে না। পথের কিছু কিছু অংশ ভাঙ্গা রয়েছে, চলছে নির্মাণের কাজ, ডিনামাইট ফাটিয়ে পাথর ভেঙ্গে পথ প্রশস্ত হচ্ছে। তার বিকট শব্দে পাহাড়ের নির্জন, শান্ত পরিবেশ খান খান হয়ে ভেঙ্গে পড়ছে, ভেঙ্গে পড়ছে পাথরের সাথে বড় বড় গাছ, উপড়ে পড়ছে পথে, ভয়ার্ত পাখির দল ডানা ঝাপটে ডাকতে ডাকতে চক্কর খাচ্চে নীল আকাশে। PWD কর্মীরা আমাদের পাকদন্ডীর পথ দেখায়। পথ চলতে পর পর আওয়াজ পেলাম কয়েকটি ডিনামাইট ফাটার। মনে হল পর পর যেন অনেকগুলো বাজ পড়ল পাহাড়ের নানান দিকে। পাহাড়ের গায়ে শব্দের ধাক্কা লেগে প্রতিধ্বনি তুলে ছড়িয়ে পড়ছে অনেক দূরে। মাটি আলগা হচ্ছে, মাঝে মাঝে ধস নামছে, সাবধানে পথ চলতে হচ্ছে। একবার পা হড়কালে কোথায় গিয়ে পড়ব জানিনা। তাই, সাবধানে, অতি সাবধানে এগিয়ে চলি ধসা অঞ্চলগুলো।

দেখতে দেখতে বেলা বাড়ে, সূর্যদেব মাথার উপর বিরাজ করেন। হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে। এদিকে সকালের সেই নদীর সুমিষ্ট জল কখন শেষ হয়ে গেছে। তেষ্টায় গলা শুকিয়ে যাচ্ছে। তাই সর্বাগ্রে লক্ষ রাখছি কোথায় কোনো অমৃতধারার সন্ধান পাওয়া যায় কিনা। কিছুটা চলার পর পেয়েও যাই পথের ধারে, যেন স্বর্গ থেকে নেমে এসেছে কোনো অপ্সরী নৃত্যরতা অবস্থায়। শীতল, সুমিষ্ট জল মগে ভেরে পান করি ও অপরকে পান করাই। সকলের তেষ্টা মেটে। হাঁটায় উৎসাহ জাগে। শম্ভুদা আজ সকাল থেকে সকলের সঙ্গে হাসি, ঠাট্টা, মসকরা করে সকলকে মজিয়ে রেখেছেন। পথশ্রমের কষ্ট ভুলে সবাই হাসতে হাসতে পথ চলি।

একটা বাঁক ঘুরতেই উল্টো দিকের পাহাড়ে দূর থেকে ছোট ছোট ঘর বাড়ি চোখে পড়ে। মালবাহকেরা বলে গুপ্তকাশী আর যে পাহাড়ে আমরা পথ চলছি সেই পাহাড়ের ঢালে উখিমঠ। দেখা যায় দূর থেকে। চোখে পড়ে পাহাড়ের গায়ে এক সুউচ্চ রঙিন অট্টালিকা। জানা গেল ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের ৭তলা ধর্মশালা। হাঁটার উৎসাহ দ্বিগুন বেড়ে যায়? দ্রুত এগিয়ে যাই মঠের দিকে।

এসে পড়ি উখিমঠের (৪,৩০০ ফুট) মন্দিরে। প্রকাণ্ড তোরণ। সুউচ্চ প্রাচীরে ঘেরা দুর্গের আকার। ভিতরের অঙ্গনে চারদিকে সারি সারি ঘর এরই মাঝে ছোট ছোট মন্দির রয়েছে। উষা, অনুরুদ্ধ, চিত্রলেখা, গঙ্গা, মান্ধাতা ও নবদুর্গা মন্দির। এরই মাঝখানে পাথরে গড়া মূল মন্দিরে রয়েছেন ওঁকারেশ্বর শিব। পঞ্চমুখ শিবের মূর্তি রূপোর তৈরি। বলা হয় কেদারনাথের গদি। পঞ্চকেদারের প্রতিমূর্তি কারণ শীতে দীপাবলি থেকে অক্ষয়তৃতীয়া কেদারনাথের ও মহমহেশ্বরের মন্দির বন্ধ হলে উখিমঠে ছয়মাস বাবার পুজো পাঠ হয়। কেদার বদরী মন্দির কমিটির মূল দপ্তর রয়েছে এখানে। কেদারনাথ মন্দিরের প্রধান পূজারীর বাসও এখানে। শুনলাম অসুররাজ বাণরাজার রূপসী কন্যা উষা ও শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধের অমর প্রেম কাহিনী। অনার্য রাজকন্যা প্রেমে পড়েন আর্য রাজকুমার অনিরুদ্ধের। এঁদের বিয়েতে মত ছিল না অসুররাজের। এই নিয়েই যুদ্ধ বাধে বাণরাজার সঙ্গে কৃষ্ণ বলরামের। কৃষ্ণের কাছে বাণরাজা পরাজিত হলে বিয়ে মেনে নেন। উষার নাম থেকে কালক্রমে উষামঠ পরিবর্তিত হতে হতে হয়েছে উখিমঠ।

বাস স্ট্যান্ড-এর কাছে একটা ছোটো হোটেলে আমরা জায়গা পেলাম রাত্রি যাপনের জন্য। খুব ভোরে উঠে মঠে পুজো দিয়ে প্রাতরাশ সেরে চোপতা যাবার বাসের খোঁজ করি। বাস আসে বলে সাড়ে সাতটায় ছাড়বে। ফাঁকা গাড়িতে আমরা জায়গা রাখলাম দশ জনের। কিছু পরেই পর পর যাত্রী এসে সব সীট ভরিয়ে দিলে দুমিনিট আগেই বাস ছাড়ে। কেদারের পথে গুপ্তকাশী থেকে উখিমঠ জিপ বা ট্যাক্সিতে চলা যায়। দূরত্বও বেশি নয় মাত্র ১৩ কিমি আর রুদ্রপ্রয়াগ থেকে ৪৯ কিমি। উখমঠের অপর পারে গুপ্তকাশী মাঝে বয়ে চলেছে কেদারের কাছে চোরাকারিতাল বা গান্ধীসরোবর থেকে উৎপন্ন মন্দাকিনী নদী। উখিমঠ থেকে চোপতাগামী বাসে সারি গ্রামে নেমে মাত্র ৩ কিমি ট্রেক করে জঙ্গলময় পথে অনায়াসে পৌছে যাওয়া যায় দেওরিয়াতাল প্রায় ১০,৮৫০ ফুট উচ্চতায়। শুনেছি আকাশ মেঘমুক্ত থাকলে হ্রদের স্বচ্ছ জলে রজতশুভ্র তুষার শিখর চৌখাম্বার প্রতিবিম্ব দেখে মানুষ মোহিত হয়ে যায়। এছাড়া দেওরিয়াতাল থেকে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের দৃশ্য নাকি অসাধারণ। তবে, এই দুর্লভ দৃশ্য উপভোগ করতে গেলে হ্রদের তীরে রাত্রিবাস করতে হবে। আমাদের উদ্দেশ্য পঞ্চকেদার দর্শন সেজন্য এ যাত্রায় বর্ণনা শুনেই স্বাদ মেটাতে হয়। যদি আবার

কখনও পরমেশ্বরের কৃপায় এ পথে আসার সুযোগ মেলে তখন দেখে যাব এই বলে মনকে প্রবোধ দিই।

বাস চলেছে একদিকে পাহাড় পাশে গভীর খাদ স্রোতস্বিনী মন্দাকিনী প্রবাহিত হচ্ছে স্বর্গ থেকে অপরদিকে পাহাড়ের গায়ে গুপ্তেশ্বর সেখানে রোদ পড়েছে খেলাঘরের মতো দেখাচ্ছে ঘর, বাড়ি, মন্দির। খাদের নীচের দিকটায় কুয়াশায় ঢাকা কিছুই চোখে পড়ে না। পথের ধারে চেনা অচেনা গাছের ভিড়। লোকালয় ছাড়িয়ে এগিয়ে চলেছি চোপতার দিকে। একটা বাঁক পেরোতেই দূর থেকে ঝলমল করে উঠল শ্বেতশুভ্র চির তুষারাবৃত গিরিরাজ :- কেদারনাথ পর্বতশৃঙ্গ (২২৯৬৮ ফুট)। এই চির নিহারময় পর্বতমালার অনবদ্য আকর্ষণ আমাদের আচ্ছন্ন করে রাখে অনেকক্ষণ। পারিপার্শ্বিক দৃশ্যাবলী চোখ ফেরাতে দেয় না। চোখের পলক পড়লে বোধ হয়, এই বুঝি কিছু অদেখা রয়ে গেল। যা দেখি সবই ছবির মতো।

সকাল ৮.৫৫ মিনিটে বাস পৌঁছে গেল তুঙ্গনাথের গেটওয়ে চোপতায় (৯৫৭০ ফুট)। চোপতার প্রাকৃতিক দৃশ্যও অনবদ্য। দেখা যায় বরফে ঢাকা চৌখাম্বা, গৌরীশঙ্কর, ত্রিশূল, সুমেরু, কেদারনাথ, ডোম, যোগীন, বন্দরপুঞ্জ, গঙ্গোত্রী ইত্যাদি নানান শিখর। চোপতার ৬ কিমি দূরে পাঙ্গের বাসায় কস্তুরী মৃগ প্রজনন কেন্দ্র রয়েছে। এখানে একটু বিশ্রাম নিয়ে চা, প্রাতরাশ ইত্যাদি খেয়ে ঠিক ৯.৩৫ মিনিটে শুরু হল তুঙ্গনাথ যাত্রা। তুঙ্গনাথ-এর পথ নির্দেশের ফলকে লেখা রয়েছে চোপতা থেকে দূরত্ব মাত্র ৩.২০ কিমি। উচ্চতা ৩৫০০ মিটার। দূরত্বটা ঠিকই আছে কিন্তু উচ্চতার ব্যাপারে একটু সংশয় দেখা দিল কারণ, এতদিন বিভিন্ন ভ্রমণ বইতে দেখেছি লেখা আছে পঞ্চকেদার তথা কেদার বদরি অঞ্চলের মন্দিররাজির মধ্যে সবচেয়ে উঁচু অঞ্চলে অবস্থান তুঙ্গনাথ মন্দিরের (১২০৭২ ফুট)। আর এখানে পথ নির্দেশের ফলকে যে উচ্চতার হিসাব দেওয়া তাকে ফুটে পরিবর্তন করলে দাঁড়ায় ১১৫৫০ ফুট। কেদারনাথ মন্দির ১১,৭৫০ ফুট উচ্চতায় অবস্থিত যা এর থেকে ২০০ ফুট বেশি। উচ্চতার এই বৈষম্য দেখে আশ্চর্য লাগল। জানিনা পরবর্তীকালে সংশোধন হয়েছে কিনা।

ভারতের শৈবতীর্থের সর্বোচ্চ মন্দির তুঙ্গনাথে মহিষরূপী শিবের বাহু লিঙ্গ স্বরূপকে দর্শনের জন্য মন যখন ভীষণ উদ্‌গ্রীব সে সময় কি আর উচ্চতার মিটার/ফুটের জটিল হিসাব নিকেশের মধ্যে মনকে আবদ্ধ করে রাখা যায়। এখন শুধু দু চোখ ভরে হিমালয়ের নৈসর্গিক দৃশ্য দেখতে দেখতে পথ চলা। টানা চড়াই। তিনি কিলোমিটার পথে প্রায় ২৫০০ ফুট চড়াই ভাঙতে হবে। প্রথমদিকে পথের দু পাশে হাল্কা জঙ্গল। পরে ক্রমশ: ঘন হয়ে বড় বড় গাছগুলো পাথরের উপর যেন হুমড়ি খেয়ে পড়তে চায়। বিশাল মহীরূহের বিস্তৃত ডালপালা সূর্যের প্রখর তাপকে রাস্তার উপর পড়তে দিতে চায় না। সেজন্য ছায়া ঘেরা এই পথে চড়াই ভাঙতে অত কষ্ট হয় না। কঠিন চড়াই-এর গল্প শুনিয়ে কেউ কেউ মনে ভয় ধরিয়ে দিয়েছিলেন। পথে নেমে দেখি দেওদার, পাইন আর রডোডেনড্রনের মাঝে দিব্যি হেঁটে চলেছি। তবে হ্যাঁ, মাঝে মাঝে একটু দাঁড়াই, অপেক্ষা করি সহযাত্রীদের জন্যে এতেই বিশ্রাম হয়। আবার হাঁটি দ্বিগুণ উৎসাহে। কখনও আবার পাকদন্ডীর পথ ধরে দীর্ঘ পথকে হ্রস্ব করে তুলি। বিশাল বিশাল সুউচ্চ থামের মতো পাইনের ফাঁক থেকে দূরে—অনেক দূরে তুষারাচ্ছাদিত গিরিশৃঙ্গ দেখা যায়। হাওয়ায় সরু সরু পাতাভরা ডালপালা দোল খেলে আওয়াজ ওঠে সর্ সর্ করে। পাথর সাজান পথে পাইনের ঝরা পাতা কাঁটায় যেন প্রকৃতি রাণী নরম

গালিচা পেতে দিয়েছেন। চলতে বেশ আরাম হয়। আবার ঝরা পাতার স্নিগ্ধ সুবাস বাতাসে ভর করে ভেসে আসে নাকে। এইভাবে কিছুটা পথ চলার পর দেখি আর জঙ্গল নেই। একেবারে ন্যাড়া পাহাড়। রোদ ঝলমল করছে। চড়াই হলেও সোজা রাস্তা। বাঁক কম। মহমহেশ্বরের পাহাড়ের মতো অত ঘোর প্যাঁচ বা বাঁক নেই এ অঞ্চলটায়। (ক্রমশ)

মৌনতার বিরুদ্ধে

মৃণাল দত্ত

কবি, কোন নির্বাক সাধনায় মগ্ন তুমি
এখন চুপ করে থাকা পাপ
এখন তোমার অক্ষরমালায় বজ্রধ্বনি আনো।

এখন শান্ত থাকা পাপ
দ্যাখো প্যালেস্তাইনে আগুন
মণিপুরে অশান্ত বাতাসে বারুদের গন্ধ
আর আমাদের এই বাংলায়
ভাইয়ের চাপচাপ রক্ত ঘরে বাইরে।

তুমি এখনো মৌন আছো
এখন সিধু কানুহর মাদল বাজাও
প্রতি অক্ষরে আনো ভগৎ সিংয়ের ইনকিলাবি আওয়াজ
এখন প্রতিটি অক্ষরে আগুনের স্পর্ধা আনো
কানপেতে শোনো দূরাগত গান
আসন্ন বিজয়ের॥

জনস্বাস্থ্য পরিষেবায় সদা জাগ্রত
পিপলস্ রিলিফ কমিটি (পঃ বঃ)
২৬সি, দিলখুসা স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০১৭
দূরভাষ ঃ ২২৮০ ৪৯৪০ / ৯৪৪৪
যাদবপুর কেন্দ্র

বকুল দত্ত স্মৃতি ভবন
৩/৮০, চিত্তরঞ্জন কলোনি, রাজা এস.সি.মল্লিক রোড, যাদবপুর, কলকাতা - ৭০০ ০৩২
বাস স্টপ ঃ অন্নপূর্ণা, 'একতা হাইটস' এর পাশে
দূরভাষ-২৪২৫ ৪৪৫৪ (সকাল ৮-১১টা/সন্ধ্যা ৬-৮টা)

বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক মণ্ডলী ঃ কবে, কখন

পরামর্শ ১০০টাকা + পি.আর.সি. সহায়তা ১০টাকা (প্রতিবার)

১) ডঃ উৎপল ব্যানার্জী - এম.এস. (অর্থোপেডিক) ২য় ও ৪র্থ সোমবার সন্ধে ৬টা
২) ডঃ মৌমিতা চাটার্জী - এম. ডি. (জেনারেল অ্যান্ড চেষ্ট মেডিসিন) - মঙ্গলবার সন্ধে ৬টা
৩) ডঃ কে. মজুমদার - এম.ডি (জেনারেল মেডিসিন) বিকেল ৫টা
৪) ডঃ সুদীপ্ত গুপ্ত - ডি.জি.ও (গাইনোকলজিস্ট) সন্ধে ৭টা
৫) ডঃ সৌম্য চ্যাটার্জি - এম.ডি. (নিউরো- সাইকিয়াট্রিস্ট ও নেশা মুক্তি) শুক্রবার সন্ধে ৮টা
৬) শ্রীমতী ছন্দলীনা মহাপাত্র (মেন্টাল কাউন্সিলিং) শুক্রবার সন্ধে ৭টা
৭) শ্রীমতী অঞ্জলী দাস (ফিজিওথেরাপিস্ট) সোম, বৃহঃ, শনি, সন্ধে ৬.৩০

নির্দিষ্ট সময়ের ৩০ মিনিট আগে নাম লেখাতে হবে

কম খরচে সমস্ত রকম প্যাথোলজি
সোমবার থেকে শনিবার (সকাল ৮-১১টা, বিকাল ৭-৮টা
যোগাযোগ ঃ ২৪২৫-৪৪৫৪

Published by Goutam Roychowdhury on behalf of Bethune Institute of Geriatrics Research & Rehabilitation Centre Ph. : 033 2473 9642, 9674553477 and printed at Monalisa Printers, D/26 Katjunagar, Kolkata - 700 032 and Published at 392A, Prince Anwar Shah Road, Kolkata - 700 045, Editor - Goutam Roychowdhury.
E-mail- bethune geriatrics@gmail.com. Website : bethunegeriatric.in